Inventing Hindu Supremacy

মিহির দালাল

(প্রকাশকাল: ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)

ভাষান্তর : মোস্তাফিজুর রহমান জাভেদ

নরেন্দ্র মোদির ভারতকে বুঝতে হলে হিন্দু ডানপন্থার সবচেয়ে প্রভাবশালী মতাদর্শীয় চিন্তা, যে-ঔপনিবেশিক ভারতীয় বাস্তবতা থেকে সেই চিন্তার জন্ম, এবং বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক দুর্বলতাকে বোঝা জরুরি।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার মানুষ। লন্ডনে আইন পড়েছেন, শেক্সপিয়ার পড়তে ভালোবাসতেন, বাইবেলের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখেছেন, এবং দক্ষ কবি ও নাট্যকার হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আবেগ ছিল রাজনীতি।

কৈশোর থেকেই সাভারকর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন, এবং দ্রুতই ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে দীর্ঘ কারাবাসের সময় তিনি এক নতুন রূপ নেন;—তিনি হয়ে ওঠেন ভারতীয় মুসলমানদের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী এক হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ববাদী।

জেলে গোপনে লেখা তাঁর পুস্তিকা *Essentials of Hindutva* (১৯২৩) এখনও হিন্দু জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বই এবং পরবর্তী লেখাগুলোতে তিনি দাবি করেন, জাতপাতের বিভাজনে দুর্বল হয়ে পড়া হিন্দুদের একক ও অভিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে একত্রিত হতে হবে এবং তাদের 'প্রাচীন মাতৃভূমি' পুনর্দখল করতে হবে সেইসব মানুষের কাছ থেকে, যাদের তিনি বহিরাগত মনে করতেন;—বিশেষ করে মুসলমানদের কাছ থেকে। সাভারকরের মতে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘাতই ছিল উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের একত্র করার প্রধান উপায়। তিনি লিখেছিলেন :

> *নিজের অস্তিত্বকে মানুষ সবচেয়ে বেশি অনুভব করে 'অন্যের' সঙ্গে সংঘাতে। কোনো কিছুরই ক্ষমতা নেই মানুষকে জাতিতে এবং জাতিকে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার, যতটা পারে এক সাধারণ শত্রুর চাপ। ঘৃণা যেমন বিভক্ত করে, তেমনি একত্রও করে।*

সাভারকরের এই ধারণা কেবল নির্দেশনামূলকই ছিল না, ভবিষ্যদ্বাণীমূলকও ছিল বলা যায়। গত চার দশকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের সহিংসতা সত্যিই মোদির ভারতীয় জনতা পার্টিকে (BJP) এমন একধরনের হিন্দু রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, যেটিকে একসময় অসম্ভব মনে করা হতো।

তবে হিন্দু ও হিন্দুধর্ম নিয়ে সাভারকরের কিছু মতামত আবার হিন্দুত্ববাদী ডানপন্থীদের জন্য অস্বস্তিকরও। তিনি নিজে ছিলেন এক ধরনের অজ্ঞেয়বাদী। তাঁর মতে, 'হিন্দুত্ব'—অর্থাৎ তাঁর নির্মিত হিন্দু জাতীয়তাবাদ—হিন্দুধর্ম নামের বাস্তব ধর্মটির চেয়েও বড়ো কিছু। জীবনের শেষদিকে তিনি হিন্দুদের সমালোচনা করতে থাকেন এবং বলেন, তাদের মুসলমানদের মতো হওয়া উচিত;—অন্তত মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর-যে ধারণা ছিল, সেরকম। মধ্যযুগে মুসলমানরা সুযোগ পেলেই হিন্দু নারীদের ধর্ষণ ও ধর্মান্তর করত—এমন অভিযোগ তুলে সাভারকর এটিকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির 'কার্যকর পদ্ধতি' হিসেবে বর্ণনা করেন। এর বিপরীতে তিনি হিন্দুদের 'আত্মঘাতী বীরত্ববোধ'-র সমালোচনা করেন, যেখানে শত্রুর নারীদের প্রতিও সম্মান দেখানো হতো। তিনি গরুপূজা এবং আরও নানা হিন্দু আচার নিয়ে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করেছিলেন। এমনকি তাঁর ধর্মপ্রাণ হিন্দু স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তিনি শেষকৃত্যের ধর্মীয় আচার সম্পন্ন করতে অস্বীকৃতি জানান। সাভারকরের হিন্দুত্ববাদ থেকেই প্রেরণা নিয়ে একশো বছর আগে বিজেপির মূল সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS)-এর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু মজার বিষয় হলো, RSS সরাসরি রাজনীতিতে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সাভারকর তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন। তাঁর কথিত মন্তব্য ছিল : 'একজন আরএসএস কর্মীর সমাধিলিপি হবে—সে জন্মেছিল, আরএসএসে যোগ দিয়েছিল, তারপর কিছুই না করেই মারা গেছে।'

২০১৪ সালে মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত সাভারকরকে খুব কম ভারতীয়ই চিনতেন, আর যারা চিনতেন, তাদের কাছেও তিনি মূলত একজন গৌণ স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে বিজেপি-আরএসএস সাভারকরকে সামনে এনে হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রকল্প শুরু করে। আজকের বিজেপি সাভারকরকে জওহরলাল নেহরু ও মহাত্মা গান্ধীর সমপর্যায়ের কিংবা তাদের চেয়েও বড়ো জাতীয়তাবাদী প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চায়। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত লিখেছেন, যদি কংগ্রেসের 'তুষ্টিকরণ নীতির বিরুদ্ধে সাভারকরের পুনঃপুন সতর্কবার্তা' গুরুত্ব পেত, তাহলে ভারতভাগ, অর্থাৎ পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাওয়া এড়ানো যেত। কিন্তু বাস্তবে সাভারকরকে এভাবে সামনে আনা অনেক জটিল ইতিহাসকে আড়াল করে দেয়;—যে-ইতিহাসটি ডানপন্থীরা মরিয়া হয়ে চাপা দিতে চায়।

সাভারকর ১৮৮৩ সালে পশ্চিম ভারতের নাসিকের কাছে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রম সম্পতের ২০১৯ সালের বিশদ, অনেকাংশে ভক্তিমূলক জীবনীগ্রন্থে সাভারকরকে এক বিস্ময়বালক হিসেবে দেখানো হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তিনি পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন এবং হিন্দু মহাকাব্য, বই, সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক সাময়িকী সবকিছুই আগ্রহ নিয়ে পড়তেন,—মারাঠি ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই। মাত্র বারো বছর বয়সে একটি সংবাদপত্র তাঁর মারাঠি কবিতা প্রকাশ করে; আরেকটি পত্রিকা ছাপে হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধ।

চার ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয় সাভারকর নয় বছর বয়সে কলেরায় মাকে হারান, আর সাত বছর পরে প্লেগে বাবাকে হারান। কৈশোরেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। সম্পতের মতে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের

সাংবিধানিক পদ্ধতি, যা ধীরেসুস্থে স্থানীয় স্বার্থের পক্ষে কথা বলছিল,—সাভারকরের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়নি। বরং তিনি অনুপ্রাণিত হন সেই অল্প কয়েকজন বিপ্লবীর দ্বারা, যারা ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের হত্যা করেছিল। নিজের গোপন সংগঠনের সদস্যদের সামনে সাভারকর ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ে বক্তৃতা দিতেন এবং উনিশ শতকের ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী জিউসেপে গ্যারিবাল্ডি ও জিউসেপে মাজিনির প্রশংসা করতেন। এই দুই ব্যক্তিত্ব তাঁর চিন্তার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হওয়ার পর, ১৯০২ সালে তিনি কলা বিভাগে পড়ার জন্য কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করেন সংস্কৃত ও গ্রিক ক্লাসিক, ইংরেজি কবিতা, আন্তর্জাতিক ইতিহাস, এবং বিভিন্ন বিপ্লবীর জীবনী।

স্নাতক সম্পন্ন করার পর সাভারকর আইন পড়তে লন্ডনে যান। কিন্তু তাঁর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে বসেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া। তিনি ভারতীয় শিক্ষার্থীদের এক বোর্ডিং হাউসে থাকতেন, যেখানে বহু সহযোদ্ধার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; তাদের মধ্যে অনেককেই তিনি আরও চরমপন্থী করে তুলেছিলেন।

সাভারকরের গোপন সংগঠন *অভিনব ভারত* ভারতে অস্ত্র ও বোমা তৈরির নির্দেশিকা পাচার করত। ১৯০৯ সালে এই সংগঠন লন্ডনে ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেটের সহকারী উইলিয়াম হাট কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করে। তার আগেই সাভারকর ব্রিটিশদের এতটাই উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলেন-যে ১৯০৬ সালে লন্ডনে পৌঁছানোর পর থেকেই তাঁকে নজরদারিতে রাখা হয়। ১৯১০ সালে তাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য ভারতে পাঠানো হয়। ততদিনে ভারত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে। আর এই ঔপনিবেশিক বর্ণনাগুলো সাভারকরসহ অনেক ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৭৫০-এর দশক থেকে শুরু হওয়া প্রায় সত্তর বছরের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইউরোপীয় ও স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে এবং দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারত শাসন করা মোগল সাম্রাজ্যকে নিজেদের পুতুলে পরিণত করে। ব্রিটিশ বণিকেরা লুটপাট ও নির্মম লোভের মাধ্যমে এই দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। আর তাদের লেখক, মিশনারি ও ইতিহাসবিদেরা সেই শাসনের নৈতিক বৈধতা তৈরি করতে ভারতকে এক 'অধঃপতিত সভ্যতা' হিসেবে তুলে ধরেছিল,—যাকে নাকি ব্রিটিশ শাসন উদ্ধার করতে পারে। কিছু ইউরোপীয় চিন্তাবিদ, প্রাচ্যবিদ ও রোমান্টিক লেখক আবার প্রাচীন হিন্দু ভারতকে সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে মহিমান্বিত করেছিলেন। কিন্তু তারাও একইসঙ্গে ভারতের 'অবক্ষয়' নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে উচ্চবর্ণের বহু হিন্দু এই ঔপনিবেশিক বর্ণনাগুলোকে মেনে নেয়। বিশেষ করে একটি প্রশ্ন তাদের তাড়িয়ে বেড়াত : ভারতের মতো এত বিশাল একটি দেশ কীভাবে এত ছোট একটি দ্বীপরাষ্ট্রের কাছে পরাজিত হলো? ভারতীয় বা হিন্দু ইতিহাস নিয়ে এই ধরনের আত্মসমালোচনামূলক ভাবনাই পরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে ভূমিকা রাখে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ধরে নিতে শুরু করে যে 'জাতীয়' হিন্দু-ভারতীয় পরিচয় নাকি আদিকাল থেকেই ছিল—যদিও বাস্তবে তা ছিল না।

কিন্তু এই ধারণা থেকেই তারা বর্তমান সময়ে সেই 'হারিয়ে যাওয়া' হিন্দু-ভারতীয় পরিচয় পুনরুদ্ধারের তাগিদ অনুভব করতে থাকে।

আসলে ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ নিজেদের আধুনিক অর্থে 'হিন্দু' বা 'মুসলমান' হিসেবে দেখত না। মানুষের পরিচয় ছিল বহুস্তরীয়—অঞ্চল, বর্ণ, পারিবারিক বংশপরিচয় ইত্যাদি ছিল গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়। ধর্ম ছিল সেই পরিচয়গুলোর মাত্র একটি অংশ। রাজনৈতিক তাত্ত্বিক সুদীপ্ত কবিরাজসহ অনেক গবেষক এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। কিন্তু উনিশ শতকে কিছু উচ্চবর্ণের হিন্দু, ব্রিটিশ সামরিক ও শিল্পশক্তির শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ হয়ে, নিজেদের ধর্মকে 'শুদ্ধ' করার আন্দোলন শুরু করে। তারা হিন্দুধর্মকে খ্রিস্টধর্মের মতো আরও সংগঠিত ও একরৈখিক করে তুলতে চেয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, হিন্দুধর্মকে দুর্বল করে দিচ্ছে এমন বিষয়গুলো,—যেমন বৈষম্যমূলক জাতপ্রথা, অসংখ্য দেবদেবী, নানা সম্প্রদায় ও বিচিত্র আচার—এসব ঝেড়ে ফেলতে পারলে ভারত আবার মহান হয়ে উঠবে।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে ভারতীয় ইতিহাসের এক মৌলিক ও স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরেছিল। কিন্তু বাস্তবে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও সহনশীলতাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার; উন্মত্ত ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়। ইতিহাসবিদ মানান আসিফ আহমেদ তাঁর *The Loss of Hindustan* (২০২০) গ্রন্থে লিখেছেন, ব্রিটিশ শাসনের আগে বহু শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান 'হিন্দুস্তান'কে শুধু হিন্দুদের নয়, বরং মুসলমান ও খ্রিস্টানসহ 'বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের' একটি অভিন্ন মাতৃভূমি হিসেবে ভাবতেন। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভিন্ন এক কাহিনি নির্মাণ করল। সেখানে বলা হলো, মুসলিম আক্রমণকারীরা নাকি এক হাজার বছর ধরে হিন্দুদের নিজেদের ভূখণ্ডেই দাসত্বে রেখেছিল। এই বর্ণনা দক্ষিণ এশিয়ার বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে বিকৃত করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার ধারণা প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রিটিশ আদমশুমারিও এই বিভাজনকে আরও শক্তিশালী করে। তারা সমগ্র ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা, একরূপ গোষ্ঠী হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করল, যা তাদের মধ্যে একদিকে সংহতি তৈরি করল, অন্যদিকে সংঘাত ও বৈরিতাও উসকে দিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং ইতিহাসবিদ ক্রিস্টোফার বেইলির ভাষায় 'পুরোনো দেশপ্রেম'-র মিশ্রণে এক সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তার ধারণা তৈরি হতে শুরু করে। একইসঙ্গে মুসলিম জাতীয়তারও একটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, প্রাথমিক রূপ গড়ে উঠতে থাকে।

এই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের ভেতর দাঁড়িয়েই সাভারকর ১৯০৯ সালে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রথম স্থায়ী প্রভাব ফেলেন। সে-বছর প্রকাশিত হয় তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ *The Indian War of Independence of 1857*. ১৮৫৭ সালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য ও অভিজাত শ্রেণি, ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া মোগল সাম্রাজ্যের পতাকার নিচে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এটি ছিল শাসিত জনগণের পক্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সশস্ত্র অভ্যুত্থানগুলোর

একটি। কিন্তু ব্রিটিশ ইতিহাসবিদেরা এই ঘটনাকে কেবল ‘সিপাহি বিদ্রোহ’ বলে ছোট করে দেখিয়েছিলেন, যেন এটি অসন্তুষ্ট কয়েকজন সৈন্যের বিদ্রোহ, কোনো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার লড়াই নয়।

সাভারকর এই ধারণাকে পাল্টাতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ বিনায়ক চতুর্বেদী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *Hindutva and Violence* (২০২১)-এ দেখিয়েছেন, সাভারকর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নথি ও গবেষণাগুলোকে ‘উল্টো দিক থেকে’ পড়ে ভারতীয় ইতিহাসকে ব্রিটিশ ব্যাখ্যার হাত থেকে পুনরুদ্ধার করতে পারতেন। ফরাসি ও আমেরিকান বিপ্লবের পাশাপাশি মাজিনির উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেও তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই প্রভাবেই সাভারকর ১৮৫৭ সালের ঘটনাকে ভারতের স্বাধীনতার ‘প্রথম যুদ্ধ’ হিসেবে পুনর্গঠন করেন। আজও ভারতে ১৮৫৭-কে মূলত সেই নামেই দেখা হয়। তাঁর এই বই ছিল আবেগময় ও রোমান্টিক বর্ণনায় পূর্ণ, যেখানে ভারতীয় যুদ্ধনায়কদের মহিমান্বিত করা হয়েছে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে।

এই বইতেই সাভারকর তাঁর ইতিহাসচিন্তার একটি কেন্দ্রীয় ধারণা হাজির করেন : সহিংসতা এক ধরনের রহস্যময় ঐক্যসৃষ্টিকারী শক্তি। তাঁর মতে, ১৮৫৭ সালের যুদ্ধেই প্রথমবারের মতো হিন্দু ও মুসলমান সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, আর সেই ঐক্যের মাধ্যম ছিল সহিংসতা। রাজনৈতিক তাত্ত্বিক শ্রুতি কাপিলা তাঁর *Violent Fraternity* (২০২১) বইয়ে সাভারকরের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, একসঙ্গে ব্রিটিশদের ‘রক্ত ঝরানোই’ হিন্দু-মুসলমান বন্ধনের জন্ম দিয়েছিল। সাভারকরের হিন্দু-মুসলমান ইতিহাসবোধ আংশিকভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিজ অঞ্চল মহারাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের ধর্মীয়-রাজনৈতিক মুঘলবিরোধী ঐতিহ্য থেকে। ইতিহাসবিদ প্রাচি দেশপান্ডে তাঁর *Creative Pasts* (২০০৭) গ্রন্থে এই বিষয়টি দেখিয়েছেন। তবে সাভারকর ছিলেন এক ধরনের বেছে নেওয়া চিন্তক;—তিনি ঐতিহ্য থেকে কেবল সেই অংশই গ্রহণ করতেন, যা তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানানসই। তিনি লিখেছিলেন, আঠারো শতকে হিন্দু রাজারা মোগলদের পরাজিত করে শতাব্দীর পর শতাব্দীর মুসলিম শাসনের প্রতিশোধ নিয়েছিল, ফলে ‘দাসত্বের কলঙ্ক’ মুছে গিয়েছিল। অর্থাৎ হিন্দুরা নিজেদের ‘সার্বভৌমত্ব’ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল, আর সেই কারণেই তারা পরে মুসলমানদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়তে পেরেছিল। আর ১৮৫৭ সালের সহিংসতার শক্তি এতটাই প্রবল ছিল-যে, সাভারকরের ভাষায়, তখন ভারত পরিণত হয়েছিল ‘ইসলাম ও হিন্দুধর্মের অনুসারীদের এক অভিন্ন জাতিতে’। *The Indian War of Independence of 1857* এবং এর লেখক সাভারকর তখন ভারতের প্রায় সব রাজনৈতিক ধারার মানুষের কাছেই প্রশংসিত হয়েছিলেন।

এই বইটিই ছিল সাভারকরের যৌবনের শিখর। কিন্তু এরপর দ্রুতই তাঁর জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। তাঁর শিশু পুত্র গুটিবসন্তে মারা যায়, আর বড়ো ভাই রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। ১৯১০ সালে সাভারকর নিজেও আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বঙ্গোপসাগরের সেই দণ্ডদ্বীপ ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এক কারাগার। তাঁর গোপন সংগঠনের সহিংস কর্মকাণ্ডের কারণেই তিনি কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তবে এর চেয়েও বেশি ব্রিটিশদের আতঙ্কিত করেছিল তাঁর ‘রাষ্ট্রদ্রোহমূলক’ লেখাগুলো, যেগুলো সাধারণ মানুষের

মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে দিতে পারত। ইতিহাসবিদ জানকি বাখলে ২০১০ সালে এ কথাই লিখেছিলেন।

কারাগার সাভারকরকে ভেঙে দেয়। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, সেখানে তিনি প্রায়ই আমাশয়, ফুসফুসের রোগ ও ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন। মাসের পর মাস তাকে একাকী বন্দিত্বে রাখা হয়েছিল, আর টানা আট বছর স্ত্রীকে দেখার অনুমতিও পাননি। আইরিশ জেলার ছিল নিষ্ঠুর, আর মুসলমান প্রহরীরা হিন্দু বন্দিদের প্রতি অত্যাচারী আচরণ করত। প্রায় আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া সেই অবস্থায় সাভারকর ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমার আবেদনপত্র দেন। তিনি বিপ্লবী রাজনীতি ত্যাগের ঘোষণা দেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবা করার প্রতিশ্রুতিও দেন। আজও সাভারকরকে ঘিরে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলোর একটি এটি। যদিও তাঁর আবেদনগুলো প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, পরে ১৯২০-এর দশকের শুরুতে তাকে পশ্চিম ভারতের অপেক্ষাকৃত কম কঠোর একটি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।

এদিকে ততদিনে গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। গান্ধীর ধর্মীয় ভাবমূর্তি ও ত্যাগী জীবনযাপন সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। এর আগে আন্দোলনটি মূলত শিক্ষিত অল্পসংখ্যক ভারতীয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গান্ধীর বিশেষত্ব ছিল তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অহিংসা, নৈতিকতা, সামাজিক সংস্কার ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রায়ই অন্য জাতীয়তাবাদীদের অস্বস্তিতে ফেলতেন। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কিছু ভারতীয় মুসলমান খিলাফত রক্ষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের চাপ দিয়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখা, যা বিশ্ব মুসলিম সংহতির প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। গান্ধী হিন্দুদেরও এই আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন, যদিও তাদের সঙ্গে বিষয়টির সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সাভারকরের সঙ্গে গান্ধীর দেখা হয়েছিল, কিন্তু মানুষ হিসেবে এবং তাঁর রাজনীতির প্রতি সাভারকরের গভীর অবজ্ঞা ছিল। তাঁর কাছে গান্ধীর রাজনীতি সেকেলে ও দুর্বলতাপূর্ণ বলে মনে হতো। খিলাফত আন্দোলন সাভারকরের মধ্যে আবারও মুসলমানদের দ্বারা ভারত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা জাগিয়ে তোলে। তবে এটিকে শুধু ইসলামভীতি বলে ব্যাখ্যা করলে পুরো বাস্তবতা ধরা পড়ে না। ঔপনিবেশিক যুগে ধীরে ধীরে যে-গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গড়ে উঠছিল, অনেক প্রভাবশালী মুসলিম নেতা একে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাদের আশঙ্কা ছিল, গণতন্ত্র বিস্তৃত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা রাজনৈতিকভাবে প্রাধান্য পাবে এবং মুসলমানরা ক্ষমতা হারাবে। তারা নিজেদেরকে ভারতের ঐতিহাসিক শাসকগোষ্ঠী হিসেবে দেখতেন। তাদের ধারণা ছিল, ভারতের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাদের প্রভাব শুধু জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত হতে পারে না। পাকিস্তানের ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ *দ্য পাকিস্তান প্যারাডক্স* (২০১৫)-এ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ক্রিস্তফ জ্যাফ্রেলো এভাবেই লিখেছেন। কিছু মুসলিম নেতা ব্রিটিশদের কাছে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য প্যান-ইসলামবাদের ভাষা এবং সহিংসতার হুমকিও ব্যবহার করেছিলেন। খিলাফত আন্দোলনের পর সাভারকরের মনে হয়, তাঁর *Indian War* গ্রন্থে যে-যৌথ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের

প্রশস্তি তিনি করেছিলেন, ভারতীয় মুসলমানরা তা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের 'বিভক্ত আনুগত্য'-র কারণে, অর্থাৎ ভারতের বাইরের মুসলমানদের প্রতিও তাদের আবেগ ও স্বার্থ জড়িত ছিল। ২০১০ সালে ইতিহাসবিদ বাখলে লিখেছেন, এই প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়ায় সাভারকর যেন এক 'প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক'-এর মতো আচরণ করেছিলেন।

Hindutva গ্রন্থে সাভারকর ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের কাঠামোকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় ধারণা অনুযায়ী, একটি জাতি গঠনের জন্য দরকার একটি অভিন্ন জনগোষ্ঠী, অভিন্ন সংস্কৃতি ও দীর্ঘ যৌথ ইতিহাস। পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিস্টধর্ম, জাতিগত পরিচয় এবং ভাষা—এই উপাদানগুলোকে একটি অভিন্ন জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, অন্তত সেখানকার জাতীয়তাবাদীরা তেমনটাই দাবি করত। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে সেই ভিত্তি কী হতে পারে? সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুধর্মকে সাভারকরের কাছে পুরোপুরি উপযুক্ত মনে হয়নি। কারণ খ্রিস্টধর্মের মতো এর কোনো একক ধর্মগ্রন্থ, একক চার্চ বা কেন্দ্রীয় ধর্মীয় কাঠামো ছিল না, যা সবাইকে একসূত্রে বাঁধতে পারে। আবার ভারতীয় মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ও ভারতীয় জাতীয় পরিচয়কে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করছিল। ফলে, শ্রুতি কাপিলার ভাষায়, বৃহৎ এক 'ভারতীয় পরিচয়' নির্মাণের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মই সাভারকরের সামনে 'সবচেয়ে বড় বাধা' হয়ে দাঁড়ায়। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাভারকর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীদের পথ অনুসরণ করেননি। বরং তিনি হিন্দুদের এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক পরিচয়ে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাই হিন্দু ধর্মগ্রন্থকে নয়, তিনি তাঁর মতাদর্শের ভিত্তি হিসেবে বেছে নেন ইতিহাসকে—যাকে আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত রাজনৈতিক চিন্তার সবচেয়ে আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানভিত্তি হিসেবে দেখা হতো।

ইতিহাসের দিকে ফিরে গিয়ে সাভারকর দেখাতে চেয়েছিলেন, ভারতের ভেতরে জন্ম নেওয়া সব ধর্মের—হিন্দুধর্ম, শিখধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম অনুসারীরা একই ঐতিহাসিক বংশপরম্পরার অংশ। সেই অভিন্ন ঐতিহ্যের নাম তিনি দেন 'হিন্দুত্ব' বা 'হিন্দু-সত্তা'। তাঁর ভাষায়, 'হিন্দুত্ব কোনো শব্দ নয়, এটি একটি ইতিহাস।' এখানেই তিনি 'হিন্দু' কাকে বলা হবে, তাঁর নতুন সংজ্ঞাও দাঁড় করান। তাঁর মতে, যার 'পিতৃভূমি' এবং 'পবিত্র ভূমি' উভয়ই ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে অবস্থিত, তাকেই হিন্দু বলা যায়। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী কেবল হিন্দুধর্মের অনুসারীরাই নয়, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধরাও 'হিন্দু' হিসেবে গণ্য হবে, যা ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক ব্যাখ্যা। কিন্তু মুসলমান ও খ্রিস্টানদের তিনি 'বহিরাগত' হিসেবে চিহ্নিত করেন, কারণ তাদের পবিত্র ভূমি ভারতের বাইরে অবস্থিত। এখানে সামাজিক বিবর্তনবাদের প্রভাব স্পষ্ট ছিল। সাভারকর লিখেছিলেন, হিন্দুদের মনে রাখতে হবে যে 'বৃহৎ জোট গঠনই এখন সময়ের দাবি।' তাঁর ভাষায় :

লীগ অব নেশনস, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর জোট, প্যান-ইসলামবাদ, প্যান-স্লাভবাদ, প্যান-ইথিওপিয়ানবাদ—সব ছোট সত্তাই এখন নিজেদের বৃহত্তর সমষ্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে, যাতে অস্তিত্ব ও ক্ষমতার সংগ্রামে তারা আরও উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে।

সাভারকরের বিশ্বাস ছিল, হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হিন্দু ভারতকে একদিকে সাহসীভাবে আত্মীকরণ করতে হবে, অন্যদিকে নির্মমভাবে বর্জনও করতে হবে। ইতিহাসবিদ চতুর্বেদীর মতে, সাভারকর মনে করতেন হিন্দু পরিচয় মূলত সহিংসতার মধ্য দিয়েই গঠিত হয়েছে তা অষ্টম শতক থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘ ইসলামি শাসনামলেই হোক, কিংবা তারও আগে। *Hindutva*-এ সাভারকর লিখেছিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে দীর্ঘ সংঘাতের মধ্য দিয়েই 'আমাদের মানুষ নিজেদেরকে গভীরভাবে হিন্দু হিসেবে চিনতে শিখেছিল এবং এমনভাবে একটি জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, যার উদাহরণ আমাদের ইতিহাসে আগে ছিল না।' গান্ধীর ভাবনাকে খণ্ডন করার জন্য সাভারকর অহিংসাকে উপহাস করতেন। মুসলমানদের প্রতি গভীর বিদ্বেষের মতোই, অহিংসার বিরোধিতাও তাঁর আজীবনের এক কেন্দ্রীয় আবেশে পরিণত হয়েছিল।

স্পষ্ট জরুরিতাবোধ ও শক্তিশালী ভাষায় লেখা *Hindutva* দ্রুতই হিন্দুত্ববাদী ডানপন্থার কাছে *The Communist Manifesto*-র মতো মর্যাদা পেয়ে যায়। এই বই প্রকাশের কিছুদিন পরই, ১৯২৫ সালে, সাভারকরের নিজ অঞ্চল মহারাষ্ট্রের সাবেক কংগ্রেস সদস্য কেশব বালিরাম হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এটিকে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, যার কাজ হবে মতাদর্শগত প্রশিক্ষণ ও আধাসামরিক অনুশীলনের মাধ্যমে হিন্দুদের চরিত্র বদলে দেওয়া এবং তাদের 'পুরুষালি' করে তোলা, যাতে তারা 'বহিরাগতদের' পরাজিত করতে পারে। হেডগেওয়ারের ধারণা ছিল, আরএসএস সরাসরি রাজনীতিতে অংশ নেবে না। ব্রিটিশদের প্রতিক্রিয়া এড়াতে সংগঠনটি ছায়ার আড়ালে কাজ করবে এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলে ভবিষ্যতে একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করবে।

১৯২৪ সালে, টানা তেরো বছর কারাভোগের পর সাভারকর মুক্তি পান। যদিও তখনও তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল এবং তাকে গৃহবন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছিল। এই সময় তিনি সামাজিক সংস্কারমূলক উদ্যোগ নেন এবং নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক রচনায় অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রচলিত রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জোরালো প্রচার চালান এবং আন্তঃজাত ভোজন ও বিবাহের পক্ষে অবস্থান নেন। জাতপ্রথাকে তিনি বলেছিলেন 'এক জাতীয় বোকামি', যা হিন্দুদের মধ্যে 'চিরস্থায়ী সংঘাত' সৃষ্টি করেছে, এবং যাকে 'ইতিহাসের আবর্জনার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলা উচিত।' তবে তাঁর লক্ষ্য ছিল না পুরো জাতপ্রথা ধ্বংস করা। তিনি চেয়েছিলেন অন্তত এতটা বাধা দূর হোক, যাতে হিন্দুরা রাজনৈতিক ঐক্যে পৌঁছাতে পারে। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল জাতিগত বৈষম্য, জাতপ্রথার অস্তিত্ব নয়। এদিকে গান্ধীর উত্থান সত্ত্বেও সাভারকর এখনও হিন্দুদের প্রধান নেতা হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা ছাড়েননি। নিজের আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলোতে, বিন্দুমাত্র বিনয় ছাড়াই, তিনি নিজেকে এক প্রাচীন সভ্যতাগত যোদ্ধাদের ধারাবাহিকতার মহান হিন্দু হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। পরে তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায়, তাঁকে নিয়ে লেখা অতিরঞ্জিত প্রশংসামূলক একটি 'জীবনী' সম্ভবত তিনি নিজেই লিখেছিলেন।

১৯৩৭ সালে, ৫৪ বছর বয়সে আবার রাজনীতিতে ফেরার অনুমতি পাওয়ার পর সাভারকর হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন। এটি ছিল কংগ্রেসের একসময়ের একটি শাখা,

যা পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে উগ্র হিন্দু রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। আবার কারাগারে যেতে না চাওয়ায় সাভারকর তখন ব্রিটিশবিরোধী অবস্থান অনেকটাই নরম করে ফেলেন। পরিবর্তে তিনি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন তাঁর দুই প্রধান আবেশের দিকে : গান্ধী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাহিত্যিক রচনা ও তর্কমূলক লেখায় দক্ষ হলেও সাভারকরের মধ্যে কংগ্রেসকে বাস্তব রাজনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তি ও দূরদৃষ্টি ছিল না। কারাগারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর শরীর কখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। আরএসএস থেকেও তিনি নিয়মিত সমর্থন পাননি। যদিও আরএসএসের কিছু সদস্য কখনও কখনও কংগ্রেসের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, সংগঠন হিসেবে আরএসএস মোটের ওপর স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরেই ছিল। আরএসএস নেতৃত্ব ও সাভারকর উভয়েই কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে দ্ব্যর্থক অবস্থান নিয়েছিল। এর একটি বড়ো কারণ ছিল গান্ধীর অহিংসার রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রচেষ্টার প্রতি তাদের গভীর বিরাগ।

ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা সাভারকরের হাতে শেষপর্যন্ত প্রায় একটাই অস্ত্র ছিল,—মুসলমানদের প্রতি গান্ধীর কথিত ‘তুষ্টিকরণ নীতি’র বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ। ১৯৩০-র দশকে যখন মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য ভারতের ভেতর থেকে আলাদা একটি রাষ্ট্রের দাবি তোলে, সাভারকর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অবশ্য গান্ধী ও নেহরুসহ আরও অনেক হিন্দু নেতাও এই দাবির বিরোধিতা করেছিলেন, যদিও তাঁদের কারণ ছিল ভিন্ন। মুসলমানদের কাছে ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া ঠেকাতে মরিয়া সাভারকর একক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলেন, যেখানে সবার সমান অধিকার থাকবে এবং সংখ্যালঘুরা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারবে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত অবস্থান দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি মুসলমানদের ‘ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ডে’ জড়িত বলে অভিযুক্ত করতে থাকেন। একইসঙ্গে মাটির রাজনীতিতে তাঁর দল সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ উসকে দেয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সংগঠিত করে। গান্ধীর বিপরীতে, সাভারকর মুসলিম লীগের নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান আসলে ‘দুটি পৃথক জাতি’। কিন্তু তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেন, কারণ তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতজুড়ে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৪৭ সালের রক্তাক্ত দেশভাগ, যেখানে ব্রিটিশদের তত্ত্বাবধানে ভারত ভাগ হয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে বিভক্ত হয়। এর জন্য সাভারকর ও অন্যান্য হিন্দু উগ্রপন্থীরা গান্ধীকেই দায়ী করেছিল। বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রাপ্য অর্থ ভারত সরকার যেন দেয়, সেই দাবিতে গান্ধী-যে অনশন শুরু করেছিলেন, তা তাদের প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে। অবশেষে ১৯৪৮ সালে সাভারকরের অনুসারীদের একজন, নাথুরাম গডসে, গান্ধীকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পর সাভারকরের খ্যাতি অপূরণীয়ভাবে কলঙ্কিত হয়ে যায়। গান্ধী হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকেও বিচারের মুখোমুখি করা হয়। আবার কারাগারে ফেরার ভয় তাঁর মধ্যে এত গভীর ছিল-যে আদালতে তিনি গডসের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। গডসে পরে তাঁর গুরুর এই ‘হিসাবি ও প্রকাশ্য দূরত্ব বজায় রাখার’ আচরণে আঘাত পেয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত খালাস পাওয়ার পর সাভারকর রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান এবং জীবনের বাকি সময় প্রায় অজ্ঞাত অবস্থায় কাটান।

স্বাধীনতার পর প্রথম তিন দশক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বজায় রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকারকে ভিত্তি করে নেহরু ও তাঁর উত্তরসূরিরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই সময়ে হিন্দুত্ববাদী ডানপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল থাকলেও আরএসএস ধীরে ধীরে সারা ভারতে নিজেদের সাংগঠনিক উপস্থিতি বিস্তৃত করতে থাকে। গডসে যে আরএসএসের সদস্য ছিল, তা সবার জানা ছিল, ফলে গান্ধী হত্যার জন্য সংগঠনটিকেও ব্যাপকভাবে দায়ী করা হয়। হত্যাকাণ্ডের পর আরএসএসকে আঠারো মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে পড়ে সংগঠনটি শেষ পর্যন্ত সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। এই সিদ্ধান্ত থেকেই জন্ম নেয় নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল ভারতীয় জনসংঘ। আরএসএস নিজেদের সদস্যদের সেই দলে পাঠায়। শুরুতে যেটি ছিল এক ধরনের 'সুরক্ষা ব্যবস্থা', সেটিই পরে স্থায়ী রূপ নেয়,—কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত অতি প্রলোভনসঙ্কুল হয়ে ওঠে।

১৯৬৩ সালে, বার্ধক্য ও নানা শারীরিক অসুস্থতায় জর্জরিত সাভারকর তাঁর শেষ ঐতিহাসিক গ্রন্থ *Six Glorious Epochs of Indian History* প্রকাশ করেন। এখানে 'গৌরবময় যুগ' বলতে তিনি সেইসব সময়কে বুঝিয়েছেন, যখন 'সভ্যতার যোদ্ধারা' বিদেশি শাসনের শৃঙ্খল থেকে হিন্দু জাতিকে মুক্ত করেছিল। এই উচ্চাভিলাষী বইয়ে সাভারকর ইতিহাসের ভেতর এক বিজয়ী 'হিন্দু ক্ষমতাচেতনা' খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন, যাতে ভবিষ্যতের হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি পথনির্দেশ তৈরি করা যায়। বইটির বড়ো অংশজুড়ে তিনি হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন, যাকে তিনি এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এক 'মহাকাব্যিক যুদ্ধ' হিসেবে চিত্রিত করেন।

Six Glorious Epochs of Indian History বইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাঁর তীব্র ও বিষাক্ত আক্রমণাত্মক ভাষার জন্য, যেখানে সাভারকর শুধু ইসলাম বা মুসলমানদের নয়, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, এমনকি সবচেয়ে বেশি হিন্দুদেরই আক্রমণ করেছেন। এখানে তাঁর ভাষা অনেকটা ফ্রিডরিখ নীটশের খ্রিস্টধর্ম ও সাধারণ মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণার কথা মনে করিয়ে দেয়। সাভারকর হিন্দুদের তথাকথিত 'বিকৃত নৈতিকতা' নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন, যেমন অহিংসা, ধর্মীয় সহনশীলতা ও যুদ্ধের মধ্যেও নৈতিক আচরণ। তাঁর মতে, বৌদ্ধধর্ম ও তাঁর অহিংসার আদর্শ হিন্দুদের দুর্বল করে দিয়েছে। এই ব্যাখ্যা অনেকটা নীটশের সেই ধারণার মতো, যেখানে খ্রিস্টধর্ম নাকি রোমান শক্তি ও সংস্কৃতিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সাভারকর লিখেছেন, অহিংসা 'মানুষকে পৌরুষহীন করে ফেলে', এবং 'কখনও কখনও একে নিষ্ঠুর সহিংসতার মাধ্যমে হত্যা করা উচিত।' তিনি অতীতের হিন্দু শাসকদের কঠোরভাবে সমালোচনা করেন, কারণ তাদের আচরণ তাঁর চোখে ছিল 'আত্মঘাতী'। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, যুদ্ধ জয়ের পর তারা মুসলমানদের গণহত্যা করেনি, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করেনি, জোরপূর্বক ধর্মান্তর ঘটায়নি এবং মসজিদ ধ্বংসও করেনি। সাভারকরের দাবি ছিল, মুসলমানরা নাকি হিন্দুদের সঙ্গে ঠিক এভাবেই আচরণ করেছিল—আর তিনি সেই মনোভাবকেই যুদ্ধে 'অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও সম্পূর্ণ সঠিক' বলে

প্রশংসা করেন। কিন্তু হিন্দুদের এই তথাকথিত ‘বিকৃত নৈতিকতা’ তাদের ‘অগোছালো, নির্বোধ এবং অপমানবোধহীন’ করে তুলেছে বলে তিনি মনে করতেন।

*[**নোট :** এখানে লেখক নীটশের মূল ভাবনাকে সরলীকৃতভাবে ব্যবহার করেছেন, যাতে সাভারকরের মানসিক ও দার্শনিক অবস্থান বোঝানো যায়। নীটশে খ্রিস্টধর্মের সমালোচনা করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, খ্রিস্টধর্ম ইউরোপীয় মানুষের শক্তি, সৃজনশীলতা, জীবনশক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে দুর্বল করেছে। **নীটশের যুক্তি ছিল খ্রিস্টীয় নৈতিকতা দুর্বলতা, বিনয়, আত্মসমর্পণ ও কষ্টকে মহৎ গুণে পরিণত করেছে।** এই অর্থে সাভারকরের সঙ্গে একটি মিল আছে। সাভারকরও অহিংসা, সহনশীলতা ও নৈতিক সংযমকে হিন্দুদের দুর্বলতার কারণ হিসেবে দেখছিলেন। তবে নীটশের সমালোচনা মূলত ছিল নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও মানবসত্তার সৃজনশীল শক্তিকে কেন্দ্র করে। **তিনি কোনো জাতিগত বা ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ববাদী রাজনৈতিক প্রকল্প দাঁড় করাতে চাননি।**]*

হিন্দুদের শক্তি ও আধিপত্যের ইচ্ছা, সাভারকরের মতে, কেবল অল্প কিছু ‘বীর পুরুষ ও নারী যোদ্ধা’র মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল। বাকি হিন্দুরা ছিল একধরনের ভ্রান্ত চেতনার শিকার। তিনি স্পষ্টভাবেই মনে করতেন, নিজেদের সুপ্ত ‘হিন্দুত্ব’কে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে হলে হিন্দুদের তাদের প্রিয় নৈতিক মূল্যবোধ ত্যাগ করতে হবে। কাপিলা ও চতুর্বেদী দুজনেই বলেছেন, <u>সাভারকর মূলত হিন্দুদের জন্য তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডের ভেতরেই এক ধরনের ‘স্থায়ী যুদ্ধাবস্থা’র ধারণা দাঁড় করিয়েছিলেন</u>।

এই বইটি লেখা হয়েছিল দেশভাগ, গান্ধীর হত্যাকাণ্ড, কংগ্রেসের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাভারকরের নিজের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও অপমানের পরবর্তী সময়ে। ফলে বইটির ভেতরের তিক্ততা যেন সবকিছু প্রকাশ করে দেয় : যাকে প্রথমে মুসলমানরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাকেই হিন্দুরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল। <u>১৯৬৬ সালে, দীর্ঘ অসুস্থতায় ভোগা সাভারকর ৮২ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন</u>।

এরপর ১৯৭৫ সালে নেহরুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্র স্থগিত করে জরুরি অবস্থা জারি করেন ও কর্তৃত্ববাদী শাসন কায়েম করেন। এই সিদ্ধান্ত পরে ব্যাপক জনরোষের জন্ম দেয়। দুই বছরের মধ্যেই প্রথমবারের মতো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতা হারায়। বিভিন্ন দলের এক অস্থায়ী জোট সরকার গঠিত হয়, যার মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনসংঘও ছিল। <u>যদিও কংগ্রেস দ্রুতই আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে, কিন্তু তাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগ তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল</u>।

১৯৮০-র দশকে জনসংঘ নতুন রূপে বিজেপি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ‘রাম মন্দির আন্দোলন’র নেতৃত্ব দেয়, যা ভারতীয় রাজনীতিকে স্থায়ীভাবে বদলে দেয়। এক পুরোনো পৌরাণিক কাহিনিকে ভিত্তি করে বিজেপি ও তাঁর মিত্ররা দাবি তোলে-যে উত্তর ভারতের অযোধ্যায় একটি মসজিদ ষোড়শ শতকের মুসলিম আক্রমণকারীরা ভগবান রামের জন্মস্থানে নির্মিত এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর তৈরি করেছিল। বিজেপির ভাষায়, রামের জন্মস্থানের এই ‘অপবিত্রতা’ ছিল মুসলমানদের হাতে হিন্দু ভারতের ঐতিহাসিক নিপীড়নের জীবন্ত প্রতীক। সেই দাবিকে সামনে রেখে তারা উন্মত্তভাবে জনগণকে মন্দির

পুনর্নির্মাণের আন্দোলনে নামায়। কোটি কোটি হিন্দুর গভীর ভক্তির কেন্দ্র হওয়ায় রাম হয়ে ওঠেন এক অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক প্রতীক। শেষপর্যন্ত ১৯৯২ সালে উন্মত্ত হিন্দু জনতার এক দল সেই মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেয়। ১৯৮৪ সালে পাঁচশোর বেশি আসনের মধ্যে মাত্র দুটি আসন পাওয়া বিজেপি ১৯৯৮ সালের মধ্যে ক্ষমতাসীন জোটের নেতৃত্বে পৌঁছে যায়। আর ২০১৪ সাল থেকে রাম মন্দির আন্দোলনে অপেক্ষাকৃত ছোট ভূমিকা পালন করা নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন।

রামমন্দির আন্দোলনের উন্মাদনা আসলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয়নি; এটি নির্মাণ করেছিল এক উদীয়মান বিজেপি, যে তখন দুর্বল ও জীর্ণ কংগ্রেস শাসনব্যবস্থাকে উল্টে দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল। আর আজ সেই একই শক্তি, যা একসময় ছিল বিদ্রোহী, এখন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেও গভীর অনিরাপত্তায় ভোগে ও নিজের অস্বস্তিকর অতীতের স্মৃতিতে তাড়িত;—সাভারকরকে ঘিরে এই প্রচারণাও পরিচালনা করছে। এই দুই প্রচারণার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে : ডানপন্থীদের ইতিহাসের মধ্যে নিজেদের বৈধতা খুঁজে নেওয়ার তীব্র প্রয়োজন। বিজেপি সাভারকরের সেই উত্তরাধিকারই বহন করে চলেছে, যেখানে বৈধতার উৎস হিসেবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ নয়, ইতিহাসকে সামনে আনা হয়। বিজেপির শাসনকে বৈধতা দেয়নি বেদ বা ভাগবত গীতা, যা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বরং তারা দাবি করে, তাদের বৈধতার উৎস হলো হিন্দু সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাস। হাজার বছরের এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার ধারণা তৈরি করে বিজেপি-আরএসএস নিজেদেরকে সেই ‘মহান হিন্দু সভ্যতা’র রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করে। তারা নিজেদেরকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (শাসনকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২২–২৯৮), পৃথ্বীরাজ চৌহান (আনুমানিক ১১৭৮–১১৯২) কিংবা শিবাজি (১৬৭৪–১৬৮০)-এর মতো ঐতিহাসিক রাজাদের উত্তরসূরি হিসেবে দেখাতে চায়।

ভারতীয় ইতিহাসকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করে বলা কঠিন। এই ইতিহাস-দখল বিজেপি-আরএসএসের বর্জনমূলক রাজনীতিকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে, যেখানে তা কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসকে ছাপিয়েই যায় না, কখনও কখনও তার জায়গাও দখল করে ফেলে। উদাহরণ হিসেবে চলতি বছরের জানুয়ারিতে মোদির হাতে রামমন্দির উদ্বোধনের ঘটনাটি ধরা যায়, যা আধুনিক ভারতের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। এই অনুষ্ঠান সারা দেশের বহু হিন্দুর মধ্যে এক উন্মত্ত আবেগ সৃষ্টি করে। কিন্তু এটি মূলত রামের প্রতি ধর্মীয় ভক্তির উদ্‌যাপন ছিল না। বরং এটি ছিল রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ এক হিন্দু সম্প্রদায়ের নিজেদের ভূখণ্ডে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা।

বিজেপি-আরএসএস যদি ইতিহাসকে, যদিও তার একটি বড়ো অংশ ঔপনিবেশিক বয়ানের ওপর দাঁড়ানো,—নিজেদের শক্তিতে পরিণত করে থাকে, তবে সেটিই আবার তাদের দুর্বলতাও। আরএসএস এখনও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেদের লজ্জাজনক অনুপস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল। কংগ্রেস নেতারা যখন ডানপন্থীদের ‘জাতিবিরোধী’ বলতেন, মূলত এই ইতিহাসকেই বোঝাতেন। আর আজ আশ্চর্যের কিছু নয়-যে ‘জাতিবিরোধী’ শব্দটিই এখন ডানপন্থীদের সবচেয়ে প্রিয় গালিগুলোর একটি হয়ে উঠেছে। একটি সত্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় : ভারত স্বাধীন হয়েছিল গান্ধীর নেতৃত্বে এবং

গান্ধীয় পদ্ধতিতে। অথচ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ভেতরে গান্ধী ও তাঁর অহিংস পদ্ধতির প্রতি বিরাগ এত গভীর-যে সেটি লুকিয়ে রাখা কঠিন। বরং সেটিই তাদের রাজনৈতিক গঠনের কেন্দ্রীয় অংশ। ডানপন্থীরা এক ঝটকায় এই ঐতিহাসিক সত্যগুলো বদলে দিতে পারে না। আর সেখানেই সাভারকর তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁকে কংগ্রেস নিজেদের উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে দাবি করতে পারে না, অথচ যাঁর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক ছিল। তাঁর বিপ্লবী অতীত ও পরবর্তী সময়ে তাকে প্রান্তিক করে দেওয়ার ঘটনাগুলোকে ব্যবহার করে ডানপন্থীরা এক বিকল্প ইতিহাস দাঁড় করায়, যা তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপস্থিতির অস্বস্তি কিছুটা ঢেকে রাখে। এই বয়ান অনুযায়ী, গান্ধী ও নেহরু সাভারকরকে উপেক্ষা করেছিলেন, আর হিন্দুরাও বোকামির মতো হিন্দুত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। দেশভাগ ছিল এই দুই ভুল সিদ্ধান্তের ভয়াবহ ফলাফল। ইঙ্গিতটি স্পষ্ট : যদি হিন্দুরা গান্ধীর 'মুসলিম তুষ্টিকরণ'-র বদলে সাভারকর ও আরএসএসের 'পুরুষালি হিন্দুত্ব' বেছে নিত, তাহলে অবিভক্ত ভারতে তারাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হতো।

এই কারণেই সাভারকরের প্রতীকী উপস্থিতি আজ হিন্দুদের সামনে একধরনের বার্তা হয়ে দাঁড়ায় : হিন্দুত্ব ছাড়া ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা চিরকাল হুমকির মুখে থাকবে। 'যে মানুষ দেশভাগ ঠেকাতে পারতেন';—তাঁর কথায় কান দিলেই কেবল 'হিন্দু ভারত' নিরাপদ থাকবে, বিশেষ করে যখন ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে হুমকি হিসেবে দেখানো হয়, এবং ভারতের জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ মুসলমান। এই বয়ান আরও বলে : মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দুদের শাসন করেছে এবং শেষে নিজেদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রও আদায় করে নিয়েছে, তাহলে হিন্দুরা কেন তাদের 'নিজস্ব প্রাচীন মাতৃভূমি'র অবশিষ্ট অংশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে না? গান্ধী সারাজীবন এই ধরনের শক্তির রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। স্বাধীনতার পর নেহরুও সেই লড়াই চালিয়ে যান।

কিন্তু এখন হিন্দুত্ব প্রায় সব বর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেছে। ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিজেপি মোট ভোটের প্রায় ৩৭ শতাংশ পেলেও, সেই সংখ্যা হিন্দুত্বের প্রতি জনসমর্থনের প্রকৃত গভীরতা পুরোপুরি প্রকাশ করে না। বিরোধী দলগুলো বিজেপির সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু হিন্দুত্বের সরাসরি বিরোধিতা করার সাহস খুব কমই দেখায়। যেমন, নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করা কংগ্রেসও সাভারকরকে আক্রমণ করতে গিয়ে সাধারণত ব্রিটিশদের কাছে তাঁর ক্ষমাভিক্ষার প্রসঙ্গ তোলে;—তাঁর হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ববাদী মতাদর্শকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে না, কারণ তাতে 'হিন্দুবিরোধী' তকমা লাগার ভয় থাকে।

বিজেপি ও আরএসএস নেতারা যখন সাভারকরকে ভারতীয় রাজনীতি ও চিন্তার কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনছেন, তখনই গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে ঘিরেও এক ধরনের পূজার সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গডসের মূর্তি, এমনকি তাঁর নামে মন্দিরও তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে গান্ধীর স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙচুরের ঘটনাও বেড়েছে।

মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত এই হিন্দুত্ববাদী প্রতীকদ্বয় যেন এখনও আগের অবস্থানেই দাঁড়িয়ে আছে : সাভারকর—গুরু হিসেবে মঞ্চের পেছনে, আর গডসে—শিষ্য হিসেবে রাস্তায়।

সম্ভবত সাভারকর আজকের ভারতীয় হিন্দুদের দেখে মনে করতেন, তারা অবশেষে সেই ‘বিকৃত গুণাবলি’ থেকে মুক্ত হচ্ছে, যেগুলো তিনি ঘৃণা করতেন—অহিংসা, সহনশীলতা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান।

. . .

[লেখক: মিহির দালাল একজন ভারতীয় সাংবাদিক ও লেখক। তিনি Big Billion Startup: The Untold Flipkart Story *(২০১৯) বইয়ের রচয়িতা। ২০২২ সালে তিনি নিউইয়র্কের Columbia University-এ নাইট-বেজহট ফেলো ছিলেন, যেখানে তিনি ব্যবসা, ভারতীয় রাজনীতি এবং আখ্যানভিত্তিক ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেন।]*